অন্তহীন গণতন্ত্রের সংগ্রাম

নূহ.উল.আলম লেনিন

প্রয়াত ঋত্বিক কলামিস্ট ও সংস্কৃতি.যোদ্ধা ওয়াহিদুল হকের দুটি পাঠকপ্রিয় কলামের নাম ছিল 'এখনও গেল না আঁধার' এবং 'অভয়বাজে হৃদয় মাঝে।' পাণ্ডিত্য, অনুপম বাকভঙ্গিমা, তীব্র হলাহল এবং প্রচণ্ড আশাবাদ ছিল তার লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'এখনও গেল না আঁধার' শিরোনামে অভিব্যক্ত আক্ষেপ ও প্রচ্ছন্ন হতাশা প্রবল আত্মবিশ্বাসে রূপান্তরিত হয় 'অভয়বাজে হৃদয় মাঝে' শিরোনামে। অদ্ভুত সাযুজ্য আমাদের অতিক্রান্ত এবং বহমান সময়ের সঙ্গে।

ওয়াহিদ ভাইয়ের শৈশব.কৈশোর কেটেছে ব্রিটিশ শাসনামলে। আমার শৈশব.কৈশোর পাকিস্তানি জিন্দানখানায়। আমি জণ্মাবধি তিনটি শব্দ উচ্চারিত হতে শুনে আসছি। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং মুক্তি। আমার স্কুল শিক্ষক বাবা ওই শব্দ তিনটির পেছনে ছুটে ব্রিটিশ শাসকদের রোষানলে পড়ে একাধিকবার রাজ অতিথি হবার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৪৮ সালে 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়' শ্লোগান তুলে রাষ্ট্রদ্রোহী হওয়ায় পাকিস্তান আমলে প্রথম এবং ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিয়ে ৯২.ক ধারা জারির পর দ্বিতীয়বার কারাগারে নিক্ষেপ্ত হন। বয়োজ্যেষ্ঠ আমার বাবা এবং ওয়াহিদ ভাই ছিলেন একই দলের, একই আদর্শের কর্মী। আলাদা ছিল কর্মক্ষেত্র। শতাব্দী শেষে, ২০০০ সালে আমাদের বাড়িতে শিল্পী ইমদাদ হোসেন ও ওয়াহিদ ভাই একটি প্রতিষ্ঠানের অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন 'চড়ুই ভাতি' করতে। আর সেখানেই তিনি আশ্চর্যের সঙ্গে আবিস্কার করলেন, আমি রহমান মাস্টারের ছেলে! কিন্তু আসল কথা এটা নয়। আসল কথাটি বললেন ওয়াহিদ ভাই, তোমার বাবা তো জীবনভর স্বপ্ন দেখতে দেখতেই গতায়ু হলেন। আমারও যাবার সময় হলো। এখন তো আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়। তুমিও তো ওই দল করছো। পারবে কি বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে? আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেননি। আপন মনেই বলেছেন 'সহজ হবে না'। ওয়াহিদ ভাই সক্রিয় দলীয় রাজনীতি থেকে সরে আসেন ১৯৭০ সালে। '৭০.এ ন্যাপের টিকেটে সংসদ নির্বাচন করেছিলেন, জামানত রক্ষিত হয়নি। বুঝছিলেন, নির্বাচনী রাজনীতি করার লোক তিনি নন। দল না করলেও আমৃত্যু তিনি একটি সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের সংগ্রামে প্রবলভাবে সক্রিয় ছিলেন। ২০০১ সালে বিএনপি.জামাত জোটের ক্ষমতা লাভের পর যে বর্বরোচিত সংখ্যালঘু নির্যাতন, নারী ধর্ষণ ও ফ্যাসিবাদী হামলা পরিচালিত হয়, ওয়াহিদ ভাই তখন সংস্কৃতি কর্মী ও মানবাধিকার কর্মীদের সংগঠিত করে ভিকটিমদের পাশে দাঁড়িয়েছেন অকুতোভয়ে। সম্ভবত তিনিই প্রথম 'এথনিক ক্লিনজিং' অভিধাটি ব্যবহার করেন। আর এই কলমযুদ্ধের অপরাধে ক্ষমতাসীন বিএনপি.জামাতের সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে মাসের পর মাস তিনি এক প্রকার আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হন। এসবই ঘটেছে একটি তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক সরকারের' সময়ে।

জীবনের একেবারে অন্তিম মুহূর্তে এসে ওয়াহিদ ভাই বলেছেন, ভালোর জন্য, শুভ ও কল্যাণের জন্য আমাদেরকে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আক্ষেপ করে বলেছেন, সেই ব্রিটিশ আমল থেকে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মুক্তির জন্য লড়াই করছে। এ লড়াই আর শেষ হবে না।

মুক্তিযুদ্ধের পর আমার বাবা আলো দেখতে পেয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। মনে হয়েছে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, এবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যাবে। স্বাধীন বাংলাদেশতো এদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই ফসল। এবার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তথা সামাজিক মুক্তির সংগ্রাম। কিন্তু আমার বাবার সেই বার্ধক্যতাড়িত শরীরের উজ্জ্বল চোখ জোড়া ম্লান হতে বেশি সময় লাগেনি। তৎকালীন আওয়ামী লীগের ডাকসাঁইটে নেতা শাহ মোয়াজ্জেমের দক্ষিণহস্ত বলে কথিত চাচাতো ভাই, সরাসরি বাবার ছাত্র কুখ্যাত ইকবাল ভিন্নমতের কারণে প্রকাশ্য দিবালোকে হাটের মাঝে বাবাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। ইকবালের অস্ত্রের ভয়ে সাহস করে কেউ প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেনি। স্তম্ভিত, ক্ষুব্ধ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক আমার বাবার প্রত্যাশায় উজ্জ্বল দুই চোখে নেমে এসেছিল অজানা অন্ধকার। তারপরও তিনি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি। তিনি বিশ্বাস করতেন ১৯৪৮ ও ৫৪ সালে

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তার সহবন্দি, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা তার 'মুজিব ভাই' এটা জানতে পারলে নিশ্চয়ই শাহ মোয়াজ্জেম.ইকবাল গংদের ক্ষমা করবেন না। কিন্তু আমার বাবা জানতে পারেননি শাহ মোয়াজ্জেম.ইকবালরা খোদ 'মুজিব ভাইকে'- বঙ্গবন্ধুকে পর্যন্ত ক্ষমা করেনি। ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময় কার্যত উপযুক্ত চিকিৎসা ও পথ্যেরঅভাবে মৃত্যুর আগে বাবা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আরও অনেকদূর যেতে হবে। মুক্তিতো দূরের কথা স্বাধীনতাই পূর্ণরূপে ধরা দেয়নি। আর গণতন্ত্রের যে নমুনা তিনি দেখেছিলেন, তাতে মনে হয়েছে পাকিস্তানের এবং মুসলিম লীগের আছর থেকে বের হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার।

বাবা যখন মারা যান (সেপ্টেম্বর ১৯৭৫) তখন বাকশাল গঠনের তোড়জোড় চলছে। আমি তখন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি। আমরা তখনই জেনে গেছি বঙ্গবন্ধু সাময়িকভাবে হলেও বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র স্থগিত করছেন। একদলীয় ব্যবস্থা চালু করছেন। বাবা এসব কথা জানতেন। বাবা বলতেন, তোরা মুজিব ভাইকে বল, এটা ঠিক হবে না। এদেশের মানুষ গণতন্ত্র বলতে বোঝে বহুদল, বহুমত, ইলেকশন, খুশি মতো ভোট দিতে পারা। আমার বাবার কথা বঙ্গবন্ধুর কানে পৌঁছেনি। মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে হলেও বঙ্গবন্ধু যে একদলীয় ব্যবস্থাপ্রবর্তন করেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ তা গ্রহণ করেনি। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জাতীয় সংসদে গণতান্ত্রিক ব্যাপারটি যে গণতন্ত্রসম্মত হয়নি, এই সত্য আজও অনেকে সাহস করে উচ্চারণ করতে চান না। প্রকারান্তরে একদলীয় ব্যবস্থা চালু করায় গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিই তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে।

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তান ও মুসলিম লীগের আছর পাওয়া বিপথগামী সেনাসদস্যগণ সপরিবারে হত্যা করে। একাত্তরে উদিত সূর্য মাত্র সাড়ে চার বছরের মাথায়, পঁচাত্তরে অস্ত যায়। বাংলাদেশ আবার কার্যত পাকিস্তানি আমলে ফিরে যায়।

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মুক্তির জন্য বাঙালির সুদীর্ঘ সংগ্রাম মুখ থুবড়ে পড়ে। বস্তুত নব পর্যায়ে পশ্চাৎগমন সেই থেকে শুরু। আবার মার্শাল ল, কার্ফিউ, জরুরি অবস্থা, সংবিধান অকার্যকর, মৌলিক অধিকার স্থগিত। যত দোষ 'রাজনীতির'। জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিখ্যাত ঘোষণা, 'আই মেইক পলিটিকস ডিফিকাল্ট ফর পলিটিশিয়ান।' দুর্নীতি ও রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য রাজনীতিবিদদের কারাগারে আটক। তারপর যথারীতি শুরু আইউব খানে মতোই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, গোয়েন্দা বাহিনী ও অর্থ (কর্নেল (অব.) অলির স্বীকারোক্তি স্মর্তব্য) ব্যয় করে রাজনৈতিক দল গঠন, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের একাংশকে দলে অন্তর্ভুক্তকরণ, রিমোট কন্ট্রোল নির্বাচন অনুষ্ঠান করে দুই তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং যথেচ্ছভাবে সংবিধান কর্তন ইত্যাদি। এর নাম মার্শাল ডেমোক্রেসি, বেসামরিক লেবাসে। ১৯৮২ সালে আরেক জেনারেলের আবির্ভাব। রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের সরকারের ব্যর্থতার অজুহাতে সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল হুসেন মুহম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল। আনুষ্ঠানিক সামরিক শাসন জারি ও ক্ষমতা দখলের আগে জেনারেল এরশাদ সংবিধান এবং রীতি.প্রথা ভেঙে 'রাষ্ট্র পরিচালনায় সশস্ত্র বাহিনীর অংশীদারিত্বের তত্ত্ব' হাজির করেন। ক্ষমতা দখলের পর যথারীতি পূর্বসূরীর মতো সংবিধান, গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার হরণ করেন এবং জিয়াউর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একই কায়দায় রাজনৈতিক দল (জাতীয় পার্টি) গঠন, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংবিধান সংশোধন করেন। মওদুদের মতো দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দলের নেতৃত্বে টেনে আনেন। দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গ্রহণ করে।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর মাত্র বছর তিনেক বিরতি দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ আবার গণতন্ত্রের সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ওই সংগ্রামে অসংখ্য মানুষ, তরুণ আত্মদান করে। বাংলাদেশের মাটি পৌণপুনিকভাবে শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়। গণতন্ত্র, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও ভোটাধিকারের জন্য অকাতরে আত্মবিসর্জন দেয় এ দেশের মানুষ।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরশাসনের অবসান হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে পা বাড়ায় বাংলাদেশ। ১৯৯১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত পনের বছর এদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। খুব মধুর নয়

এই অভিজ্ঞতা। একটি বহুত্ববাদী সংস্কৃতির অঙ্কুরোদগম হয়েছে বটে, তবে ওটিকে প্রোটেক্ট করার ব্যবস্থাটি টেকসই নয়। সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার না হলেও আর্থ.সামাজিক ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। গণতন্ত্র ও সুশাসনের জন্য জনসচেতনতা বেড়েছে।

কিন্তু সকল অগ্রগতি ও সকল সম্ভাবনাকে নস্যাত করতে উদ্যত হয়েছে সর্বগ্রাসী দুর্বৃত্তায়ন। রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রেই দুর্বৃত্তরা জেঁকে বসেছে। দুর্বৃত্তায়নের জণ্ম সামরিক.অসামরিক স্বৈরশাসনের গর্ভে। দেড় দশকের সংসদীয় গণতন্ত্র অতীতের স্বৈরশাসনের উত্তরাধিকার ঝেড়ে ফেলতে তো পারেইনি, উল্টো জাতীয় সংসদ, নির্বাচন ব্যবস্থা, প্রশাসন, বিচার বিভাগসহ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। এ ব্যাপারে বিএনপি.জামাত জোটই হচ্ছে মূল অপরাধী। জাতীয় সংসদকে অর্থবহ করে তোলার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেইসব ইতিবাচক পদক্ষেপকে কার্যকর করতে বিরোধী দলের, বিশেষত বিএনপির অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে যথেষ্ট নমনীয়তা প্রদর্শন করতে পারেনি। কনফ্রুকটিং রাজনীতির দ্বারা যে মহৎ কাজ হয় না, এই উপলব্ধি যথেষ্ট ছিল না। পক্ষান্তরে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিএনপি.জামাত জোট ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মোড়কে প্রধানত রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাটকেই একমাত্র কর্তব্যজ্ঞান করে দেশে নিকৃষ্ট ধরনের সংসদীয় স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। সবচেয়ে ভয়াবহ হলো, যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় ফিরে আসার লক্ষ্যে পুরো নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করার আয়োজন সম্পন্ন করেছে। ইয়াজউদ্দিনের মতো ইয়েসম্যানকে দিয়ে অবৈধভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দখল করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটিকে পর্যন্ত অর্থহীন করে তুলেছে। এই পটভূমিতে এক সংঘাতময় পরিস্থিতিতে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা, নির্বাচন স্থগিত, মৌলিক অধিকার রহিত এবং দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধিষ্ঠান হয়।

তখন গণতন্ত্রের প্রশ্নটি আবার আমাদের সামনে প্রধান এজেন্ডা হিসেবে সামনে এসেছে। দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করে নির্বাচনকে কালো টাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত করা, নির্বাচন ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে স্থায়ী ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্নটিও তীর্যকভাবে সামনে এসেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দল দীর্ঘ দুই বছর ধরে সংস্কারের ইস্যুতে যে জনমত গড়ে তুলেছিল, তা বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই লক্ষ্যে বহুমুখী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আওয়ামী লীগসহ সেক্যুলার গণতান্ত্রিক ধারার দলগুলো সাধারণভাবে এসব পদক্ষেপকে সমর্থনও জানিয়েছে।

কিন্তু তারপরও বাংলাদেশের রাজনীতির আকাশ থেকে সংশয়ের মেঘ কাটেনি। সংস্কারের নামে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ, সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে দেশের বাইরে নির্বাসনে ঠেলে পাঠানোর উদ্যোগ এবং একটা ভয়ের সংস্কৃতির জণ্ম দিয়ে 'রাজনীতিকে ক্রটিমুক্ত' করার প্রয়াস কতোটা গণতন্ত্রসম্মত সমভাবে সেই প্রশ্নও আমাদের সামনে উঠেছে। খালেদা, হাসিনা যদি কোনও অপরাধ করে থাকে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রচলিত আইনে কেন তাদের বিচার করা যাবে না, তাদের প্রভাব ও শক্তিকে অতটা বড় করে দেখার বা ভয় পাবার কী আছে, সঙ্গতভাবেই এসব প্রশ্ন উঠেছে। বরং গণতন্ত্রের স্বার্থে জাতীয় নেতাদের সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করানোই হতো বুদ্ধিমানের কাজ। প্রকৃত সত্য (যদি তা অপ্রিয়ও হয়) জানতে পারলে জনগণ বিশেষত দলীয় কর্মীরাই ঠিক করতে পারতো কাকে তারা নেতৃত্বে রাখবে আর কাকে ছুঁড়ে ফেলবে। দেশবাসী ও রাজনৈতিক কর্মীদের বিচারবুদ্ধি ও সচেতনতার ওপর বিশ্বাস ও আস্থাহীনতাই অগণতান্ত্রিক উপায়ে 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্টদের প্ররোচিত করতে পারে। আমি মনে করি আখেরে এ ধরনের পদক্ষেপ কাউন্টার প্রোডাকটিভ হতে বাধ্য। গণতন্ত্র কেউ দান করতে পারে না। স্বাধীনতার মতোই গণতন্ত্র অর্জন, রক্ষা এবং নির্মাণ করতে পারে সচেতনা জনগণের সংগঠিত শক্তি। ব্যারাকে বা কারখানায় তৈরি রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব, পেটেন্ট বা ফরমায়েশি ব্যবস্থা ও আদর্শ শেষ পর্যন্ত যে টেকসই হয় না, মানুষের কল্যাণে আসে না বিএনপি ও জাতীয় পার্টিই কি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন

নয়? বংশ পরম্পরায় গণতন্ত্রের সংগ্রাম করতে করতে এখন জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে আমাদের মনে হচ্ছে গণতন্ত্র সম্ভবত এক সোনার হরিণ। তবু কবিগুরুর ভাষায় ‘আমার সোনার হরিণচাই/ সে যে চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় যায় না তারে বাঁধা/ সে যে নাগাল পেলে পালায় ছুটে লাগায় চোখে ধাঁধা/ আমি ছুটবো পিছে মিছে মিছে পাই বা নাহি পাই/ আমি আপন মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই।’

২২.০৪.২০০৭

নূহ.উল.আলম লেনিন: রাজনীতিক ও কলাম লেখক।